

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

বই নং ৩১ | www.motaher21.net

أَقِيمُوا الدِّينَ

"দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত কর"

"Establish Religion"

সূরা: আশ-শূরা

আয়াত নং :-13

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى
الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ

তিনি তোমাদের জন্য দ্বীনের সেই সব নিয়ম-কানুন নির্ধারিত করেছেন যার নির্দেশ তিনি নূহকে দিয়েছিলেন এবং (হে মুহাম্মাদ) যা এখন আমি তোমার কাছে অহীর মাধ্যমে পাঠিয়েছি। আর যার আদেশ দিয়েছিলাম আমি ইবরাহীম (আ), মুসা (আ) ও ঈসাকে (আ)। তার সাথে তাগিদ করেছিলাম এই বলে যে, এ দ্বীনকে কায়ম করো এবং এ ব্যাপারে পরস্পর ভিন্ন হয়ো না। ২০ (হে মুহাম্মাদ) এই কথাটিই এসব মুশরিকের কাছে অত্যন্ত অপছন্দনীয় যার দিকে তুমি তাদের আহবান জানাচ্ছে। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা আপন করে নেন এবং তিনি তাদেরকেই নিজের কাছে আসার পথ দেখান যারা তাঁর প্রতি রুজু করে। ২১

তাকসীর :

টিকা:২০) প্রথম আয়াতে যে কথাটি বলা হয়েছিলো এখানে সেই কথাটিই আরো বেশী পরিষ্কার করে বলা হয়েছে। এখানে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, মুহাম্মাদ ﷺ কোন নতুন ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা নন। নবী-রসুলদের মধ্যে কেউই কোন নতুন ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন না। প্রথম থেকেই সমস্ত নবী-রসূল আল্লাহর পক্ষ থেকে একই দ্বীন পেশ করে আসছেন। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও সেই একই দ্বীন পেশ করছেন। এ প্রসঙ্গে সর্বপ্রথম হযরত নূহের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। মহাপ্লাবনের পর তিনিই ছিলেন বর্তমান মানব

গোষ্ঠীর সর্বপ্রথম পয়গম্বর। তারপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নাম উল্লেখ করা হয়েছে, যিনি শেষ নবী। তারপর হযরত ইবরাহীমের (আ) নাম উল্লেখ করা হয়েছে, আরবের লোকেরা যাঁকে তাদের নেতা বলে মানতো। সর্বশেষে হযরত মুসা এবং ঈসার কথা বলা হয়েছে যাঁদের সাথে ইহুদী ও খৃস্টানরা তাদের ধর্মকে সম্পর্কিত করে থাকে। এর উদ্দেশ্য এ নয় যে, শুধু এই পাঁচজন নবীকেই উক্ত দ্বীনের হিদায়াত দান করা হয়েছিলো। বরং একথা বলে দেয়াই এর উদ্দেশ্য যে, পৃথিবীতে যত নবী-রসূলই আগমন করেছেন তাঁরা সবাই একই দ্বীন নিয়ে এসেছেন। নমুনা হিসেবে এমন পাঁচজন মহান নবীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে যাঁদের মাধ্যমে দুনিয়ার মানুষ সুবিখ্যাত আসমানী শরীয়তসমূহ লাভ করেছে।

যেহেতু এ আয়াতটি দ্বীন ও দ্বীনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে আলোকপাত করেছে। তাই সে বিষয়ে ভালোভাবে চিন্তা-ভাবনা করে তাকে বুঝে নেয়া আবশ্যিক: বলা হয়েছে **شَرَعْنَا لَكُمْ** “তোমাদের জন্য নির্ধারিত করেছেন।” **شَرَع** শব্দের আভিধানিক অর্থ রাস্তা তৈরী করা এবং এর পারিভাষিক অর্থ পদ্ধতি, বিধি ও নিয়ম-কানুন রচনা করা। এই পারিভাষিক অর্থ অনুসারে আরবী ভাষায় **تشريع** শব্দটি আইন প্রণয়ন (Legislation) **شريعة** এবং **شرع** শব্দটি আইন (Law) এবং **شارع** শব্দটি আইন প্রণেতার (Law giver) সমার্থক বলে মনে করা হয়। আল্লাহই বিশ্ব-জাহানের সব কিছুর মালিক, তিনিই মানুষের প্রকৃত অভিভাবক এবং মানুষের মধ্যে যে বিষয়েই মতভেদ হোক না কেন তার ফায়সালা করা তাঁরই কাজ। কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে এ ধরনের যেসব মৌলিক সত্য বর্ণিত হয়েছে তারই স্বাভাবিক ও যৌক্তিক পরিণতি হচ্ছে আল্লাহর এই আইন রচনা। এখন মৌলিকভাবে যেহেতু আল্লাহই মালিক, অভিভাবক ও শাসক, তাই মানুষের জন্য আইন ও বিধি রচনার এবং মানুষকে এই আইন ও বিধি দেয়ার অনিবার্য অধিকার তাঁরই। আর এভাবে তিনি তাঁর দায়িত্ব পালন করেছেন। পরে বলা হয়েছে **مِنَ الدِّينِ** ‘দ্বীন’ থেকে শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলবী এর অনুবাদ করেছেন আইন থেকে। অর্থাৎ আল্লাহ শরীয়ত নির্ধারণ করেছেন আইনের পর্যায়ভুক্ত। আমরা ইতিপূর্বে সূরা যুমারে ৩নং টীকায় **دِين** শব্দের যে ব্যাখ্যা করেছি তা যদি সামনে থাকে তাহলে একথা বুঝতে কোন অসুবিধা হওয়ার কথা নয় যে, দ্বীন অর্থই কারো নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব মেনে নিয়ে তার আদেশ-নিষেধের আনুগত্য করা। এ শব্দটি যখন পন্থা বা পদ্ধতি অর্থে ব্যবহার করা হয় তখন তার অর্থ হয় এমন পদ্ধতি যাকে ব্যক্তি অবশ্য অনুসরণীয় পদ্ধতি এবং তার যার নির্ধারণকারীকে অবশ্য অনুসরণযোগ্য বলে মনে চলে। এ কারণে আল্লাহর নির্ধারিত এই পদ্ধতিকে দ্বীনের বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন আইন বলার পরিষ্কার অর্থ হলো এটা শুধু সুপারিশ (Recomendation) ও ওয়াজ-নসীহতের মর্যাদা সম্পন্ন নয়। বরং তা বান্দার জন্য তার মালিকের অবশ্য অনুসরণীয় আইন, যার অনুসরণ না করার অর্থ বিদ্রোহ করা। যে ব্যক্তি তা অনুসরণ করে না সে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর আধিপত্য, সার্বভৌমত্ব এবং দাসত্ব অস্বীকার করে।

এরপরে বলা হয়েছে, দ্বীনের বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত এ আইনই সেই আইন যার নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো নূহ, ইবরাহীম ও মুসা আলাইহিমুস সালামকে এবং এখন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সে নির্দেশই দান করা হয়েছে। এ বাণী থেকে কয়েকটি বিষয় প্রতিভাত হয়। এক-আল্লাহ এ বিধানকে সরাসরি সব মানুষের কাছে পাঠাননি, বরং মাঝে মধ্যে যখনই তিনি প্রয়োজন মনে করেছেন এক ব্যক্তিকে তাঁর রসূল মনোনীত করে এ বিধান তার কাছে সোপর্দ করেছেন। দুই-প্রথম থেকেই এ বিধান এক ও অভিন্ন। এমন নয় যে, কোন জাতির জন্য কোন একটি দ্বীন নির্দিষ্ট করা হয়েছে এবং অন্য সময় অপর এক জাতির জন্য তা থেকে ভিন্ন ও বিপরীত কোন দ্বীন পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। আল্লাহর পক্ষ থেকে একাধিক দ্বীন আসেনি। বরং যখনই এসেছে এই একটি মাত্র দ্বীনই এসেছে। তিন-আল্লাহর আধিপত্য ও সার্বভৌমত্ব মানার সাথে সাথে যাদের মাধ্যমে এ

বিধান পাঠানো হয়েছে তাদের রিসালাত মানা এবং যে অহীর দ্বারা এ বিধান বর্ণনা করা হয়েছে তা মেনে নেয়া এ দ্বীনেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ। জ্ঞান-বুদ্ধি ও যুক্তির দাবীও তাই। কারণ, যতক্ষণ পর্যন্ত তা আল্লাহর তরফ থেকে বিশ্বাসযোগ্য (Authentic) হওয়া সম্পর্কে ব্যক্তি নিশ্চিত না হবে ততক্ষণ সে এই আনুগত্য করতেই পারে না।

অতঃপর বলা হয়েছে, এসব নবী-রসূলদেরকে দ্বীনের বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত এই বিধান দেয়ার সাথে তাগিদসহ এ নির্দেশও দেয়া হয়েছিলো যে, أَقِيمُوا الدِّينَ শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলবী এ আয়াতাংশের অনুবাদ করেছেন, “দ্বীনকে কায়ম করো” আর শাহ রফিউদ্দিন ও শাহ আবদুল কাদের অনুবাদ করেছেন, “দ্বীনকে কায়ম রাখো” এই দু’টি অনুবাদই সঠিক। اقامت শব্দের অর্থ কায়ম করা ও কায়ম রাখা উভয়ই। নবী-রসূলগণ আলাইহিমুস সালাম এ দু’টি কাজ করতেই আদিষ্ট ছিলেন। তাঁদের প্রথম দায়িত্ব ও কর্তব্য ছিল, যেখানে এই দ্বীন কায়ম নেই সেখানে তা কায়ম করা। আর দ্বিতীয় দায়িত্ব ও কর্তব্য ছিল যেখানে তা কায়ম হবে কিংবা পূর্ব থেকেই কায়ম আছে সেখানে তা কায়ম রাখা। একথা সুস্পষ্ট যে কোন জিনিসকে কায়ম রাখার প্রশ্ন তখনই আসে যখন তা কায়ম থাকে। অন্যথায় প্রথমে তা কায়ম করতে হবে, তারপর তা যাতে কায়ম থাকে সেজন্য ক্রমাগত প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

এই পর্যায়ে আমাদের সামনে দু’টি প্রশ্ন দেখা দেয়। একটি হলো, দ্বীন কায়ম করার অর্থ কি? অপরটি হলো, দ্বীন অর্থই বা কি যা কায়ম করার এবং কায়ম রাখার আদেশ দেয়া হয়েছে? এ দু’টি বিষয়ও ভালভাবে বুঝে নেয়া দরকার।

কায়ম করা কথাটি যখন কোন বস্তুগত বা দেহধারী জিনিসের জন্য ব্যবহৃত হয় তখন তার অর্থ হয় উপবিষ্টকে উঠানো। যেমন কোন মানুষ বা জন্তুকে উঠানো। কিংবা পড়ে থাকা জিনিসকে উঠিয়ে দাঁড় করানো। যেমন বাঁশ বা কোন খাম তুলে দাঁড় করানো অথবা কোন জিনিসের বিক্ষিপ্ত অংশগুলোকে একত্র করে সম্মুগ্নত করা। যেমনঃ কোন খালি জায়গায় বিল্ডিং নির্মাণ করা। কিন্তু যা বস্তুগত জিনিস নয়, অবস্তুগত জিনিস তার জন্য যখন কায়ম করা শব্দটা ব্যবহার করা হয় তখন তার অর্থ শুধু সেই জিনিসের প্রচার করাই নয়, বরং তা যথাযথভাবে কার্যে পরিণত করা, তার প্রচলন ঘটানো এবং কার্যত চালু করা। উদাহরণস্বরূপ যখন আমরা বলি, অমুক ব্যক্তি তার রাজস্ব কায়ম করেছে তখন তার অর্থ এ হয় না যে, সে তার রাজস্বের দিকে আহ্বান জানিয়েছে। বরং তার অর্থ হয়, সে দেশের লোকদেরকে নিজের অনুগত করে নিয়েছে এবং সরকারের সকল বিভাগে এমন সংগঠন ও শৃংখলা প্রতিষ্ঠা করেছে যে, দেশের সমস্ত ব্যবস্থাপনা তার নির্দেশ অনুসারে চলতে শুরু করেছে। অনুরূপ যখন আমরা বলি, দেশে আদালত কায়ম আছে তখন তার অর্থ হয় ইনসাফ করার জন্য বিচারক নিয়োজিত আছেন। তিনি মোকদ্দমাসমূহের শুনানি করছেন এবং ফায়সালা দিচ্ছেন। একথার এ অর্থ কখনো হয় না যে, ন্যায় বিচার ও ইনসাফের গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা খুব ভালভাবে করা হচ্ছে এবং মানুষ তা সমর্থন করেছে। অনুরূপভাবে কুরআন মজীদে যখন নির্দেশ দেয়া হয়, নামায় কায়ম করো তখন তার অর্থ কুরআন মজীদের দাওয়াত ও তাবলীগ নয়, বরং তার অর্থ হয় নামায়ের সমস্ত শর্তাবলী পূরণ করে শুধু নিজে আদায় করা না বরং এমন ব্যবস্থা করা যেন ঈমানদারদের মধ্যে তা নিয়মিত প্রচলিত হয়। মসজিদের ব্যবস্থা থাকে, গুরুত্বের সাথে জুমআ ও জামা’য়াত ব্যবস্থা হয়, সময়মত আযান দেয়া হয়, ইমাম ও খতিব নির্দিষ্ট থাকে এবং মানুষের মধ্যে সময়মত মসজিদে আসা ও

নামায় আদায় করার অভ্যাস সৃষ্টি হয়। এই ব্যাখ্যার পরে একথা বুঝতে কষ্ট হবার কথা নয় যে, নবী-রসূল আলাইহিমুস সালামদের যখন এই দ্বীন কায়ম করার ও রাখার যে নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো, তার অর্থ শুধু এতটুকুই ছিল না যে, তাঁরা নিজেরাই কেবল এ দ্বীনের বিধান মেনে চলবেন এবং অন্যদের কাছে তার তাবলীগ বা প্রচার করবেন, যাতে মানুষ তার সত্যতা মেনে নেয়। বরং তার অর্থ এটাও যে মানুষ যখন তা মেনে নেবে তখন আরো অগ্রসর হয়ে তাদের মাঝে পুরো দ্বীনের প্রচলন ঘটাবেন, যাতে সে অনুসারে কাজ আরম্ভ হতে এবং চলতে থাকে। এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই যে দাওয়াত ও তাবলীগ এ কাজের অতি আবশ্যিক প্রাথমিক স্তর। এই স্তর ছাড়া দ্বিতীয় স্তর আসতেই পারে না। কিন্তু প্রত্যেক বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিই বুঝতে পারবেন এই নির্দেশের মধ্যে দ্বীনের দাওয়াত ও তাবলীগকে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বানানো হয়নি, দ্বীনকে কায়ম করা ও কায়ম রাখাকেই উদ্দেশ্য বানানো হয়েছে। দাওয়াত ও তাবলীগ অবশ্যই এ উদ্দেশ্য সাধনের মাধ্যম, কিন্তু মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নয়। নবী-রসূলদের মিশনের একমাত্র উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য দাওয়াত ও তাবলীগ করে একথা বলা একেবারেই অবান্তর।

এখন দ্বিতীয় প্রশ্নটি দেখুন। কেউ কেউ দেখলেন, যে দ্বীন কায়ম করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে তা সমানভাবে সমস্ত নবী-রসূলের দ্বীন। কিন্তু তাদের সবার শরীয়ত ছিল ভিন্ন ভিন্ন। যেমন আল্লাহ কুরআন মজীদে বলেছেন لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَا “আমি তোমাদের প্রত্যেক উম্মতের জন্য স্বতন্ত্র শরীয়ত এবং একটি পদ্ধতি নির্ধারিত করে দিয়েছি।” তাই তারা ধরে নিয়েছে যে, এ দ্বীন অর্থ নিশ্চয়ই আদেশ-নিষেধ ও বিধি-বিধান নয়, এর অর্থ শুধু তাওহীদ, আখেরাত, কিতাব ও নবুওয়াতকে মানা এবং আল্লাহর ইবাদাত করা। কিংবা বড় জোর তার মধ্যে শরীয়তের সেই সব বড় বড় নৈতিক নীতিমালাও অন্তর্ভুক্ত যা সমস্ত দ্বীনের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য।

কিন্তু এটি একটি অপরিপক্ব মত। শুধু বাহিক্যভাবে দ্বীনের ঐক্য ও শরীয়তসমূহের বিভিন্নতা দেখে এ মত পোষণ করা হয়েছে। এটি এমন একটি বিপজ্জনক মত যে যদি তা সংশোধন করা না হয় তাহলে তা অগ্রসর হয়ে দ্বীন ও শরীয়তের মধ্যে এমন একটি পার্থক্যের সূচনা করবে যার মধ্যে জড়িয়ে সেন্ট পল শরীয়তবিহীন দ্বীনের মতবাদ পেশ করেছিলেন এবং সাইয়েদেনা হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের উম্মতকে ধ্বংস ও বিপর্যস্ত করেছিলেন। কারণ, শরীয়ত যখন দ্বীন থেকে স্বতন্ত্র একটি জিনিস আর নির্দেশ দেয়া হয়েছে শুধু দ্বীন কায়মের জন্য, শরীয়ত কায়মের জন্য নয় তখন মুসলমানরাও খৃস্টানদের মত অবশ্যই শরীয়তকে গুরুত্বহীন ও তার প্রতিষ্ঠাকে সরাসরি উদ্দেশ্য মনে না করে উপেক্ষা করবে এবং দ্বীনের শুধু ঈমান সম্পর্কিত বিষয়গুলো ও বড় বড় নৈতিক নীতিসমূহ নিয়েই বসে থাকবে। এভাবে অনুমানের ওপর নির্ভর করে دین এর অর্থ নিরূপণ করার পরিবর্তে কেনই বা আমরা আল্লাহর কিতাব থেকেই একথা জেনে নিচ্ছি না যে, যে দ্বীন কায়ম করার নির্দেশ এখানে দান করা হয়েছে তার অর্থ কি শুধু ঈমান সম্পর্কিত বিষয়সমূহ এবং কতিপয় বড় বড় নৈতিক মূলনীতি না শরীয়তের অন্যান্য আদেশ নিষেধও? কুরআন মজীদ বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখি কুরআন মজীদে যেসব জিনিসকে দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তার মধ্যে নিম্নোক্ত জিনিসগুলোও আছে:

وَمَا أُمْرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ - البينة : 5

“তাদেরকে এছাড়া আর কোন নির্দেশ দেয়া হয়নি যে, তারা একনিষ্ঠ চিত্তে দ্বীনকে আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট করে কেবল তাঁরই ইবাদাত করবে, নামায কায়েম করবে এবং যাকাত দেবে এটাই সঠিক দ্বীন।” এ আয়াত থেকে জানা যায়, নামায এবং রোযা এই দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত। অথচ নামায ও রোযার আহকাম বিভিন্ন শরীয়তে বিভিন্ন রকম ছিল। পূর্ববর্তী শরীয়তসমূহে বর্তমানের মত নামাযের এই একই নিয়ম-কানুন, একই খুঁটি-নাটি বিষয়, একই সমান রাকআত, একই কিবলা, একই সময় এবং এই একই বিধি-বিধান ছিল একথা কেউ বলতে পারে না। অনুরূপ যাকাত সম্পর্কেও কেউ এ দাবী করতে পারে না যে, সমস্ত শরীয়তে বর্তমানের ন্যায় যাকাতের এই একই হিসাব, একই হার এবং আদায় ও বন্টনের এই একই বিধি-নিষেধ ছিল। কিন্তু শরীয়তের ভিন্নতা সত্ত্বেও আল্লাহ এ দু’টি জিনিসকে দ্বীনের মধ্যে গণ্য করেছেন।

3-.....-المائدة: 3 “تَوَمَّادِءِ . حُرْمَتُ عَلَیْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَیْرِ اللَّهِ بِهِ..... الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِیْنَكُمْ.....”

জন্য হারাম করা হয়েছে মৃত জন্তু, রক্ত, শূকরের গোশত, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে যবেহকৃত জন্তু, দমবন্দ হয়ে, আঘাত প্রাপ্ত হয়ে, ওপর থেকে পড়ে কিংবা ধাক্কা খেয়ে মরা জন্তু অথবা যে জন্তুকে কোন হিংস্র প্রাণী ক্ষত-বিক্ষত করেছে কিন্তু তোমরা তাকে জীবিত পেয়ে যবেহ করেছো কিংবা যে জন্তুকে কোন আস্তানায় জবেহ করা হয়েছে। তাছাড়া লটারীর মাধ্যমে নিজের ভাগ্য সম্পর্কে অবহিত হতে চাওয়াকেও তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে। এসবই গুনাহর কাজ। আজ কাফেররা তোমাদের দ্বীন সম্পর্কে নিরাশ হয়ে গিয়েছে। তাই তোমরা তাদেরকে ভয় করো না, আমাকে ভয় করো। আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণতা দান করলাম।” এ থেকে জানা গেল যে, শরীয়তের এসব হুকুম আহকামও দ্বীনের মধ্যে शामिल।

29: التوبة-التوبة: 29 “فَاتْلُوا الذِّیْنَ لَا یُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْیَوْمِ الْآخِرِ وَلَا یُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا یَدِیْنُونَ بَیْنَ الْحَقِّ-التوبة: 29

তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো যারা আল্লাহ ও আখেরাত দিবসে বিশ্বাস করে না, আর আল্লাহ ও তাঁর রসূল যা কিছু হারাম করেছেন তা হারাম করে না এবং সত্য দ্বীনকে নিজের দ্বীন হিসেবে গ্রহণ করে না।” এ থেকে জানা যায়, আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি ঈমান পোষণ করা এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূল যেসব আদেশ-নিষেধ করেছেন তা মানা ও তার আনুগত্য করাও দ্বীন।

2: النور-النور: 2 “الرَّائِبَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِیْنِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ الْآخِرِ-النور: 2

“ব্যভিচারী নারী ও পুরুষ উভয়কে একশটি করে বেত্রাঘাত করো। যদি তোমরা আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি ঈমান পোষণ করো তাহলে দ্বীনের ব্যাপারে তাদের প্রতি মায়া-মমতা ও আবেগ যেন তোমাদেরকে পেয়ে না বসে।” 76: یوسف-یوسف: 76 “مَا كَانَ لِیَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِیْنِ الْمَلِكِ- یوسف: 76

“বাদশার দ্বীন অনুসারে ইউসুফ তার ভাইকে পাকড়াও করতে পারতো না।” এ থেকে জানা গেলে, ফৌজদারী আইনসমূহও দ্বীনের মধ্যে शामिल। ব্যক্তি যদি আল্লাহর দেয়া ফৌজদারী আইন অনুসারে চলে তাহলে সে আল্লাহর দ্বীনের অনুসারী আর যদি বাদশার দ্বীন অনুসারে চলে তাহলে বাদশাহর দ্বীনের অনুসারী।

এ চারটি উদাহরণই এমন যেখানে শরীয়তের আদেশ-নিষেধ ও বিধি-বিধানকে সুস্পষ্ট ভাষায় দ্বীন বলা হয়েছে। কিন্তু গভীর মনোযোগ সহকারে দেখলে বুঝা যায়, আরো যেসব গুনাহর কারণে আল্লাহ জাহান্নামের ভয় দেখিয়েছেন (যেমন ব্যভিচার, সুদখোরী, মু’মিন বান্দাকে হত্যা, ইয়াতীমের সম্পদ আত্মসাৎ, অন্যায়ভাবে

মানুষের অর্থ নেয়া ইত্যাদি) যেসব অপরাধকে আল্লাহর শাস্তির কারণ বলে উল্লেখ করা হয়েছে (যেমন: লুতের কওমের মত পাপাচার এবং পারস্পরিক লেনদেনে শু'আইব আলাইহিস সালামের কওমের মত আচরণ) তার পথ রুদ্ধ করার কাজও অবশ্যই দ্বীন হিসেবে গণ্য হওয়া উচিত। কারণ, দ্বীন যদি জাহান্নাম ও আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা করার জন্য না এসে থাকে তাহলে আর কিসের জন্য এসেছে। অনুরূপ শরীয়তের যেসব আদেশ-নিষেধ লংঘনকে চিরস্থায়ী জাহান্নাম বাসের কারণ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে সেই সব আদেশ-নিষেধও দ্বীনের অংশ হওয়া উচিত। যেমন উত্তরাধিকারের বিধি-বিধান বর্ণনা করার পর বলা হয়েছে:

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ النساء: 14

“যে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের অবাধ্য হবে এবং আল্লাহর সীমাসমূহ লংঘন করবে আল্লাহ তাকে দোষখে নিষ্ক্ষেপ করবেন। সেখানে সে চিরদিন থাকবে। তার জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাকর আযাব।”

অনুরূপ আল্লাহ যেসব জিনিসের হারাম হওয়ার কথা কঠোর ভাষায় অকাট্যভাবে বর্ণনা করেছেন, যেমন: মা, বোন ও মেয়ের সাথে বিয়ে, মদ্যপান, চুরি, জুয়া এবং মিথ্যা সাক্ষ্যদান। এসব জিনিসের হারাম হওয়ার নির্দেশকে যদি “ইকামাতে দ্বীন” বা দ্বীন প্রতিষ্ঠার মধ্যে গণ্য করা না হয় তাহলে তার অর্থ দাঁড়ায় এই যে, আল্লাহ কিছু অপ্রয়োজনীয় আদেশ-নিষেধও দিয়েছেন যার বাস্তবায়ন তাঁর উদ্দেশ্য নয়। অনুরূপ আল্লাহ যেসব কাজ ফরয করেছেন, যেমন: রোযা হজ্জ-তাও দ্বীন প্রতিষ্ঠার পর্যায় থেকে এই অজুহাতে বাদ দেয়া যায় না যে, রমযানের ৩০ রোযা পূর্ববর্তী শরীয়তসমূহে ছিল না এবং কা'বায় হজ্জ করা কেবল সেই শরীয়তেই ছিল যা ইবরাহীমের (আ) বংশধারার ইসমাঈলী শাখাকে দেয়া হয়েছিলো।

প্রকৃতপক্ষে সমস্ত ভুল বুঝাবুঝি সৃষ্টির কারণ হলো, ভিন্ন উদ্দেশ্যে (لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا) (আমি তোমাদের প্রত্যেক উম্মতের জন্য একটি শরীয়ত ও পদ্ধতি নির্ধারণ করে দিয়েছি) আয়াতের এ অর্থ করা যে, যেহেতু প্রত্যেক উম্মতের জন্য শরীয়ত ছিল ভিন্ন কিন্তু কায়ম করতে বলা হয়েছে দ্বীনকে যা সমানভাবে সব নবী-রসূলের দ্বীন ছিল, তাই দ্বীন কায়মের নির্দেশের মধ্যে শরীয়ত অন্তর্ভুক্ত নয়। অথচ এ আয়াতের অর্থ ও উদ্দেশ্য এর সম্পূর্ণ বিপরীত। সূরা মায়েদার যে স্থানে এ আয়াতটি আছে তার পূর্বপর অর্থাৎ ৪১ আয়াত থেকে ৫০ আয়াত পর্যন্ত যদি কেউ মনযোগ সহকারে পাঠ করে তাহলে সে জানতে পারবে আয়াতের সঠিক অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ যে নবীর উম্মতকে যে শরীয়ত দিয়েছিলেন সেটিই ছিল তাদের জন্য দ্বীন এবং সেই নবীর নবুওয়াত কালে সেটিই কায়ম করা কাম্য ও উদ্দেশ্য ছিল। এখন যেহেতু হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াতের যুগ, তাই উম্মতে মুহাম্মাদীকে যে শরীয়ত দান করা হয়েছে এ যুগের জন্য সেটিই দ্বীন এবং সেটিকে প্রতিষ্ঠিত করাই দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করা। এরপর থেকে ঐ সব শরীয়তের পরস্পর ভিন্নতা। এ ভিন্নতার তাৎপর্য এ নয় যে, আল্লাহর প্রেরিত শরীয়তসমূহ পরস্পর বিরোধী ছিল। বরং এর সঠিক তাৎপর্য হলো, অবস্থা ও পরিবেশ পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে ঐ সব শরীয়তের খুটিনাটি বিষয়ে কিছু পার্থক্য ছিল। উদাহরণস্বরূপ নামায ও রোযার কথাই ধরুন। সকল শরীয়তেই নামায কায়ম ফরয ছিল কিন্তু সব শরীয়তের কিবলা এক ছিল না। তাছাড়া নামাযের সময়, রাকআতের সংখ্যা এবং বিভিন্ন অংশে কিছুটা পার্থক্য ছিল। অনুরূপ রোযা সব শরীয়তেই ফরয ছিল। কিন্তু রমযানের ৩০ রোযা অন্যান্য শরীয়তে ছিল

না। এ থেকে এরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ ঠিক নয় যে, নামায ও রোযা ‘ইকামাতে দ্বীন’ বা দ্বীন প্রতিষ্ঠার নির্দেশের অন্তর্ভুক্ত ঠিকই, কিন্তু নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে নামায পড়া এবং নির্দিষ্ট কোন সময়ে রোযা রাখা ইকামাতে দ্বীনের নির্দেশ বহির্ভূত। বরং এর সঠিক অর্থ হলো, প্রত্যেক নবীর উম্মতের জন্য তৎকালীন শরীয়তে নামায ও রোযা আদায়ের জন্য যে নিয়ম-পদ্ধতি নির্ধারণ করা হয়েছিলো সেই সময়ে সেই পদ্ধতি অনুসারে নামায পড়া ও রোযা রাখাই ছিল দ্বীন কায়েম করা। বর্তমানেও এসব ইবাদতের জন্য শরীয়তে মুহাম্মাদীতে যে নিয়ম-পদ্ধতি দেয়া হয়েছে সে মোতাবেক এসব ইবাদাত বন্দেগী করা ‘ইকামাতে দ্বীন’। এ দু’টি দৃষ্টান্তের ভিত্তিতে শরীয়তের অন্যসব আদেশ-নিষেধও বিচার করুন।

যে ব্যক্তি চোখ খুলে কুরআন মজীদ পড়বে সে স্পষ্ট দেখতে পাবে যে, এ গ্রন্থ তার অনুসারীদেরকে কুফরী ও কাফেরদের আঞ্জাধীন ধরে নিয়ে বিজিতের অবস্থানে থেকে ধর্মীয় জীবন-যাপন করার কর্মসূচী দিচ্ছে না, বরং প্রকাশ্যে নিজের শাসন ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চাচ্ছে, চিন্তাগত, নৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং আইনগত ও রাজনৈতিক ভাবে বিজয়ী করার লক্ষ্যে জীবনপাত করার জন্য অনুসারীদের কাছে দাবী করছে এবং তাদেরকে মানব জীবনের সংস্কার ও সংশোধনের এমন একটি কর্মসূচী দিচ্ছে যার একটা বৃহদাংশ কেবল তখনই বাস্তব রূপ লাভ করতে পারে যদি সরকারের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব ঈমানদারদের হাতে থাকে। এ কিতাব তার নাযিল করার উদ্দেশ্য বর্ণনা করে বলে:

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ - النساء: 105

“হে নবী, আমি ন্যায় ও সত্যসহ তোমার কাছে এই কিতাব নাযিল করেছি যাতে আল্লাহ তোমাকে যে আলো দেখিয়েছেন তার সাহায্যে তুমি মানুষের মধ্যে ফায়সালা করো।”

এই কিতাবে যাকাত আদায় ও বন্টনের যে নির্দেশাবলী দেয়া হয়েছে সেজন্য তা সুস্পষ্টভাবে এমন একটি সরকারের ধারণা পেশ করেছে যে, একটি নির্দিষ্ট নিয়মানুসারে যাকাত আদায় করে হকদারদের কাছে পৌঁছানোর দায়িত্ব নেবে (আত তাওবা ৬০ ও ১০৩ আয়াত)। এই কিতাবে সুদ বন্ধ করার যে আদেশ দেয়া হয়েছে এবং সুদখোরী চালু রাখার কাজে তৎপর লোকদের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে (আল বাকারা ২৭৫-২৭৯ আয়াত) তা কেবল তখনই বাস্তব রূপ লাভ করতে পারে যখন দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা সম্পূর্ণরূপে ঈমানদারদের হাতে থাকবে। এই কিতাবে হত্যাকারীর থেকে কিসাস গ্রহণের নির্দেশ (আল বাকারা ১৭৮ আয়াত), চুরির জন্য হাত কাটার নির্দেশ (আল মায়েদা ৩৮ আয়াত) এবং ব্যভিচার ও ব্যভিচারের অপবাদ আরোপের জন্য হদ জারী করার নির্দেশ একথা ধরে নিয়ে দেয়া হয়নি যে, এসব আদেশ মান্যকারীদেরকে কাফেরদের পুলিশ ও বিচারালয়ের অধীন থাকতে হবে। এই কিতাবে কাফেরদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের নির্দেশ (আল বাকারা- ১৯০-২১৬ আয়াত) একথা মনে করে দেয়া হয়নি যে, এ দ্বীনের অনুসারীরা কাফের সরকারের বাহিনীতে সৈন্য ভর্তি করে এ নির্দেশ পালন করবে। এ কিতাবে আহলে কিতাবদের নিকট থেকে জিয়িয়া আদায়ের নির্দেশ (আত তাওবা ২৯ আয়াত) একথা ধরে নিয়ে দেয়া হয়নি যে, মুসলমানরা কাফেরদের অধীন থেকে তাদের থেকে জিয়িয়া আদায় করে এবং তাদের রক্ষার দায়িত্ব নেবে। এ ব্যাপারটি শুধু মদীনায় অবতীর্ণ সূরাসমূহ পর্যন্তই সীমাবদ্ধ নয়। দৃষ্টিশক্তির অধিকারীরা মক্কায়

অবতীর্ণ সূরাসমূহের মধ্যে স্পষ্টতই দেখতে পারেন, প্রথম থেকেই যে পরিকল্পনা ছিল তা ছিলো দ্বীনের বিজয় ও কর্তৃত্ব স্থাপন, কুফরী সরকারের অধীনে দ্বীন ও দ্বীনের অনুসারীদের জিম্মি হয়ে থাকা নয়। উদাহরণস্বরূপ দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা বনী-ইসরাইল, আয়াত ৭৬ ও ৮০ ; সূরা কাসাস, আয়াত ৮৫-৮৬ ; সূরা রুম, আয়াত ১ থেকে ৬ ; সূরা আস সাফফাত , আয়াত ১৭১ থেকে ১৭৯ , (টীকা ৯৩-৯৪) এবং সূরা সোয়াদ, ভূমিকা ও ১১ আয়াত ১২ টীকাসহ।

ব্যাখ্যার এই ভ্রান্তি যে জিনিসটির সাথে সবচেয়ে বেশী সাংঘর্ষিক তা হচ্ছে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিজের বিরূত কাজ। যা তিনি ২৩ বছরের রিসালাত যুগে সমাধা করেছেন। তিনি তাবলীগ ও তলোয়ার উভয়টির সাহায্যেই যে গোটা আরবকে বশীভূত করেছিলেন এবং বিস্তারিত শরীয়ত বা বিধি-বিধানসহ এমন একটি পূর্ণাঙ্গ রাষ্ট্রীয় আদর্শ কায়েম করেছিলেন যা আকীদা-বিশ্বাস ও ইবাদাত থেকে শুরু করে ব্যক্তিগত কর্মকাণ্ডে, সামাজিক চরিত্র, সভ্যতা ও সংস্কৃতি, অর্থনীতি ও সমাজনীতি, রাজনীতি ও ন্যায় বিচার এবং যুদ্ধ ও সন্ধিসহ জীবনের সমস্ত দিক ও বিভাগে পরিব্যাপ্ত ছিল তা কে না জানে? এ আয়াত অনুসারে নবী ﷺ সহ সমস্ত নবী-রসূলকে ইকামাতে দ্বীনের যে নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো নবীর ﷺ এসব কাজকে যদি তার ব্যাখ্যা বলে গ্রহণ করা না হয় তাহলে তার কেবল দু’টি অর্থই হতে পারে। হয় নবীর ﷺ বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আরোপ করতে হবে (মা’আয়াল্লাহ) যে, তিনি আদিষ্ট হয়েছিলেন শুধু ঈমান ও নৈতিক চরিত্র সম্পর্কিত বড় বড় মূলনীতিসমূহের তাবলীগ ও দাওয়াতের জন্য কিন্তু তা লংঘন করে তিনি নিজের পক্ষ থেকেই একটি সরকার কায়েম করেছিলেন, যা অন্যসব নবী-রসূলদের শরীয়ত সমূহের সাধারণ নীতিমালা থেকে ভিন্নও ছিল অতিরিক্তও ছিল। নয়তো আল্লাহর বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আরোপ করতে হবে যে, তিনি সূরা শূরায় উপরোক্ত ঘোষণা দেয়ার পর নিজেই তাঁর কথা থেকে সরে পড়েছেন এবং নিজের নবীর নিকট থেকে ঐ সূরায় ঘোষিত “ইকামাতে দ্বীনের” চেয়ে কিছুটা বেশী এবং ভিন্ন ধরনের কাজই শুধু নেননি, বরং উক্ত কাজকে পূর্ণতা লাভের পর নিজের প্রথম ঘোষণার পরিপন্থী দ্বিতীয় এই ঘোষণাটিও দিয়েছেন যে, **الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ** (আজ আমি তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণতা দান করলাম) নাউযুবিল্লাহি মিন যালিকা। এ দু’টি অবস্থা ছাড়া তৃতীয় এমন কোন অবস্থা যদি থাকে যেহেতু ইকামাতে দ্বীনের এই ব্যাখ্যাও বহাল থাকে এবং আল্লাহ কিংবা তাঁর রসূলের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগও না আসে তাহলে আমরা অবশ্যই তা জানতে চাইবো।

দ্বীন প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দেয়ার পর আল্লাহ এ আয়াতে সর্বশেষ যে কথা বলেছেন তা হচ্ছে **وَلَا تَتَزَوَّجُوا فِيهِ** “দ্বীনে বিভেদ সৃষ্টি করো না” কিংবা “তাতে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ো না।” দ্বীনে বিভেদের অর্থ ব্যক্তির নিজের পক্ষ থেকে এমন কোন অভিনব বিষয় সৃষ্টি করা এবং তা মানা বা না মানার ওপর কুফর ও ঈমান নির্ভর করে বলে পীড়াপীড়ি করা এবং মান্যকারীদের নিয়ে অমান্যকারীদের থেকে আলাদা হয়ে যাওয়া, অথচ দ্বীনের মধ্যে তার কোন গ্রহণযোগ্যতা নেই। এই অভিনব বিষয়টি কয়েক ধরনের হতে পারে। দ্বীনের মধ্যে যে জিনিস নেই তা এনে শামিল করা হতে পারে। দ্বীনের অকাট্য উক্তিসমূহের বিকৃত প্রায় ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়ে অদ্ভুত আকীদা-বিশ্বাস এবং অভিনব আচার-অনুষ্ঠান আবিষ্কার করা হতে পারে। আবার দ্বীনের উক্তি ও বক্তব্যসমূহ রদবদল করে তা বিকৃত করা, যেমন যা গুরুত্বপূর্ণ তাকে গুরুত্বহীন বানিয়ে দেয়া এবং যা একেবারেই মোবাহ পর্যায়ভুক্ত তাকে ফরয ও ওয়াজিব এমনকি আরো অগ্রসর হয়ে ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ বানিয়ে দেয়া। এ ধরনের আচরণের কারণেই নবী-রসূল আলাইহিমুস সালামদের উম্মতদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হয়েছে। অতঃপর এসব ছোট ছোট দলের অনুসৃত পথই ক্রমান্বয়ে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধর্মের রূপ পরিগ্রহ করেছে যার অনুসারীদের মধ্যে বর্তমানে এই ধারণাটুকু পর্যন্তও বর্তমান নেই যে, এক সময় তাদের মূল ছিল একই। দ্বীনের

আদেশ-নিষেধ বুঝার এবং অকাট্য উক্তি সমূহ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে মাসয়ালা উদ্ভাবন করার ক্ষেত্রে জ্ঞানী ও পণ্ডিতদের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই যে মতভেদ সৃষ্টি হয় এবং আল্লাহর কিতাবের ভাষার মধ্যে আভিধানিক, বাগধারা ও ব্যাকরণের নিয়ম অনুসারে যার অবকাশ আছে সেই বৈধ ও যুক্তিসঙ্গত মতভেদের সাথে এই বিবাদের কোন সম্পর্ক নেই।

[১] দ্বীন প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দেয়ার পর আল্লাহ এ আয়াতে সর্বশেষ যে কথা বলেছেন তা হচ্ছে "দ্বীনে বিভেদ সৃষ্টি করো না" কিংবা 'তাতে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ো না। পূর্ববর্তী উম্মতদের কর্মকাণ্ড থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে এ ধরনের কাজ থেকে সাবধান করে বহু হাদীস বর্ণিত হয়েছে। আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের সামনে একটি সরল রেখা টানলেন। অতঃপর এর ডানে ও বায়ে আরও কয়েকটি রেখা টেনে বললেন, ডান-বামের এসব রেখা শয়তানের আবিষ্কৃত পথ। এর প্রত্যেকটিতে একটি করে শয়তান নিয়োজিত রয়েছে। সে মানুষকে সে পথেই চলার উপদেশ দেয়। অতঃপর তিনি মধ্যবর্তী সকল রেখার দিকে ইশারা করে বললেন:

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَأَتَّبِعُوهُ

"আর এটা আমার সরল পথ, সুতরাং তোমরা এরই অনুসরণ কর।" [মুসনাদে আহমাদ: ১/৪৩৫] এ দৃষ্টান্তে সরল পথ বলে নবী-রাসূলগণের অভিন্ন দ্বীনের পথই বোঝান হয়েছে। এতে শাখা-প্রশাখা বের করা ও বিভেদ সৃষ্টি করা হারাম ও শয়তানের কাজ। এ সম্পর্কে হাদীসে কঠোর নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: "যে ব্যক্তি মুসলিমদের জামাত (সামষ্টিকভাবে সকল উম্মত) থেকে অর্ধ হাত পরিমাণও দূরে সরে পড়ে, সে-ই ইসলামের বন্ধনই তার কাধ থেকে সরিয়ে দিল"। [আবু দাউদ: ৪৭৬০] তিনি আরও বলেন, 'জামাত (তথা মুসলিম উম্মতের) উপর আল্লাহর হাত রয়েছে।' [নাসায়ী: ৪০২০] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেন, "শয়তান মানুষের জন্য ব্যাঘ্রস্বরূপ। বাঘ ছাগলের পেছনে লাগে। অতঃপর যে ছাগল পালের পেছনে অথবা এদিক ওদিক বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকে সেটির উপরই পতিত হয়। তাই তোমাদের উচিত দলের সঙ্গে থাকা-পৃথক না থাকা। [মুসনাদে আহমাদ: ৫/২৩২] মনে রাখতে হবে যে, মুসলিমরা সবাই এক উম্মত; তাদের থেকে কেউ আলাদা কোন দল করে পৃথক হলে সে উম্মতের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা ঘটালো। এটাই শরীআতে নিন্দনীয়।

পূর্বের আয়াতগুলোতে আল্লাহ তা'আলা বাহ্যিক ও দৈহিক নেয়ামত উল্লেখ করার পর এখানে তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ একটি নেয়ামতের কথা উল্লেখ করছেন তা হল : যে আল্লাহ তা'আলা আকাশ-জমিনের সবকিছুর মালিক সে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য এমন এক দীন শরীয়ত হিসেবে নির্ধারণ করে দিয়েছেন যা সব ধর্মের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ও পবিত্র। সে দীন হল ইসলাম, এ শ্রেষ্ঠ দীন দিয়ে আল্লাহ তা'আলা দুনিয়ার বুকে শ্রেষ্ঠ

মানুষদের প্রেরণ করেছেন। তাদের মধ্যে পাঁচজন হলেন ‘উলুল আযম’ রাসূল। যথা : নূহ, ইবরাহীম, মুসা, ঈসা ও আমাদের নাবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)। পৃথিবীর সূচনা লগ্ন থেকে শেষ নাবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পর্যন্ত যত নাবী-রাসূল পৃথিবীতে এসেছেন সকলের ধর্মের মূলনীতি ছিল একটি, তা হলো এক আল্লাহ তা‘আলার ‘ইবাদত করতে হবে, যিনি ব্যতীত আর কোন সত্য মা‘বুদ নেই।

প্রশ্ন হতে পারে, সর্বপ্রথম নাবী আদম (আঃ)-এর কথা উল্লেখ না করে নূহ (আঃ) দ্বারা শুরু করা হল কেন? অথচ তিনি প্রথম নাবী! উত্তর : আদম (আঃ)-এর যুগে কোন কুফর ও শির্ক ছিল না; কারণ তিনি দীন নিয়েই পৃথিবীতে আসেন এবং তা পালন করেন। সর্বপ্রথম ধর্মের নামে সুধারণা নিয়ে শির্কের প্রবর্তন করা হয় নূহ (আঃ)-এর যুগে। তাই তাঁকে দিয়ে দীনের দাওয়াত শুরু করা হয়েছে।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

(وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمَنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ ص وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا)

“আর স্মরণ কর! যখন আমি শপথ গ্রহণ করেছিলাম নাবীদের কাছ থেকে এবং তোমার কাছ থেকে, নূহ, ইবরাহীম ও ঈসা ইবনু মারইয়ামের কাছ থেকে আর তাদের থেকে গ্রহণ করেছিলাম অতি দৃঢ় প্রতিশ্রুতি।” (সূরা আহযাব ৩৩ : ৭)

আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

(وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ)

“আমি তোমার পূর্বে যখন কোন রাসূল প্রেরণ করেছি তার প্রতি এ ওয়াহী করেছি যে, ‘আমি ব্যতীত অন্য কোন সত্যিকার মা‘বুদ নেই; সুতরাং আমারই ‘ইবাদত কর।’ (সূরা আশ্বিয়া- ২১ : ২৫)

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন : আমরা রাসূলগণ বৈমাত্রের ভাই। (পিতা একই মাতা ভিন্ন) কিন্তু আমাদের সকলের ধর্ম এক ও অভিন্ন।

(أَنْ أَفِيئُوا الدِّينَ)

অর্থাৎ সকল নাবীদের প্রতি এ মর্মে ওয়াহী করেছেন যে, তোমরা দীন তথা আল্লাহ তা'আলার প্রতি ঈমান, রাসূলদের আনুগত্য ও তাওহীদের সাথে সকল ইবাদত সম্পাদন কর। এটাই সকল নাবীদের দীন, যদিও নিয়ম-পদ্ধতিতে কিছু পার্থক্য ছিল। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন :

(لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا)

“আমি তোমাদের প্রত্যেকের জন্য নির্দিষ্ট করে দিয়েছি একটি নির্দিষ্ট শারীয়াত ও একটি নির্দিষ্ট পথ।” (সূরা মায়িদা ৫ : ৪৮)

(وَلَا تَنفَرُوا فِيهِ)

অর্থাৎ ধর্মের ভেতর দলাদলি ও মতানৈক্য সৃষ্টি করিও না। এ আয়াতে ধর্ম প্রতিষ্ঠিত রাখা ফরয ও বিভেদ সৃষ্টি করা হারাম বলা হয়েছে। ধর্ম বলে ইসলামকে বুঝানো হয়েছে যা সকল নাবীদের ধর্ম। সুতরাং ধর্মের ওপর ঐক্যবদ্ধ হয়ে থাকতে হবে, বিভিন্ন দল ও মতে বিভক্ত হয়ে ফেরকা তৈরি করা যাবে না।

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

(إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ)

“নিশ্চয়ই যারা নিজেদের দীনকে (বিভিন্ন মতে) খণ্ড বিখণ্ড করেছে এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে তাদের কোন দায়িত্ব তোমার নয়; তাদের বিষয় আল্লাহর এখতিয়ারভুক্ত। আল্লাহ তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে অবহিত করবেন।” (সূরা আনআম ৬ : ১৫৯)

জামা'আতী জিন্দেগীর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা :

জামা'আতবদ্ধ হয়ে জীবন-যাপন করা প্রতিটি মুসলিম ব্যক্তির ওপর আবশ্যিক, দলে দলে বিভক্ত হওয়া হারাম। মুসলিমদেরকে জামা'আতবদ্ধ হয়ে বসবাস করার প্রতি ইসলাম যে গুরুত্ব দিয়েছে তা বর্ণনাভীত। পবিত্র কুরআনে সূরা আলি ইমরানের ১০৩ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

(وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرُّوا)

“আর তোমরা সকলে মিলে আল্লাহর রশিকে দূতভাবে আঁকড়ে ধর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না।” ইবনু কাসীর (রহঃ) বলেন : এ আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা জামা‘আতবদ্ধ জীবন যাপনের নির্দেশ করেছেন এবং দল-উপদলে বিভক্ত হতে নিষেধ করা হয়েছে। (ইবনু কাসীর) ইমাম কুরতুবী (রহঃ) বলেন : নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা‘আলা সম্প্রীতির আদেশ করেন এবং দল-উপদলে বিভক্তি হতে নিষেধ করেন। কেননা, দলাদলিতেই ধ্বংস, আর জামা‘আতবদ্ধ জীবন-যাপনেই নাজাত। (কুরতুবী)

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন : নিশ্চয়ই আল্লাহ তা‘আলা তোমাদের তিনটি বিষয়ে সন্তুষ্ট, আর তিনটি বিষয়ে অসন্তুষ্ট হন। তিনি তোমাদের জন্য সন্তুষ্ট হন যে, তোমরা তাঁরই ইবাদত করবে, তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না। আর তোমরা আল্লাহ তা‘আলার রজুকে সূদূত ও সম্মিলিতভাবে ধারণ করবে, দলে দলে বিভক্ত হবে না। আর তোমাদের জন্য অপছন্দ করেন- মানুষের কথা নিয়ে টানা-হেঁচড়া করা, অযথা বেশি বেশি প্রশ্ন করা এবং সম্পদ নষ্ট করা। (সহীহ মুসলিম হা. ১৭১৫)

অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন :

مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شَيْئًا فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ

যে ব্যক্তি মুসলিমদের জামা‘আত থেকে অর্ধ-হাত পরিমাণও দূরে সরে গেল সে ইসলামের বন্ধন তার কাঁধ থেকে সরিয়ে নিল। (আবু দাউদ হা. ৪৭৫৮, সহীহ)

তিনি আরো বলেন :

يَدُ اللَّهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ

জামা‘আতীদের সাথেই আল্লাহ তা‘আলার হাত। (তিরমিযী হা. ২১৬৬, সহীহ)

সুতরাং মুসলিমরা যতদিন জামা‘আতবদ্ধ হয়ে জীবন-যাপন করেছে ততদিন তারা পৃথিবী শাসন করেছে, কিন্তু যখনই তারা জামা‘আত ভঙ্গ করে দলাদলি সৃষ্টি করল তখনই তাদের ওপর নেমে আসল লাঞ্ছনা ও অপমান।

কোন ভেড়ার পাল থেকে একটি ভেড়া আলাদা হয়ে গেলে যেমন নেকড়ে সহজেই তাকে আক্রমণ করতে পারে ঠিক জামা‘আত থেকে আলাদা হয়ে গেলে অবস্থা তাই-ই হবে। ইসলামের মূল ভিত্তিই হল ঐক্য, একথাটি

বুঝতে পেরেছিল ইংরেজরা, তারা বুঝতে পেরেছিল সাত সাগর তের নদী পাড়ি দিয়ে ভারতবর্ষ শাসন করা সম্ভব নয়। তাই তারা নীতি গ্রহণ করল মুসলিমরা এক থাকলে তাদের ওপর শাসন কায়েম করা যাবে না, সুতরাং এদেরকে শাসন করতে হলে প্রয়োজন (ডিভাইডেড এন্ড রোল) অর্থাৎ ‘বিভাজন কর এবং শাসন কর’ নীতি। আজও আমরা সে বিভাজনে পড়ে রইলাম। সুতরাং মুসলিমদের উচিত হবে তাদের সে পুরোনো গৌরবগাঁথা ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনতে সকলে এক হয়ে ইসলামের জন্য কাজ করা।

আয়াত হতে শিক্ষণীয় বিষয় :

১. সকল নাবীদের দীনের মূলনীতি ছিল একই- এক আল্লাহ তা’আলার ‘ইবাদত করতে হবে এবং দলবদ্ধভাবে জীবন-যাপন করতে হবে, পৃথক হওয়া যাবে না।
২. সত্যের দা’ওয়াত মুশরিকদের নিকট বড়ই রাগের একটি বিষয়।
৩. মানুষের ব্যাপারে পূর্ব থেকেই সিদ্ধান্ত করে রাখা হয়েছে।
৪. সকল মুসলিমকে জামা’আত বদ্ধ হয়ে আমীরের নেতৃত্বে জীবন-যাপন করা আবশ্যিক।